নবজাতক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪৭
পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৫২

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

নবজাতক ... ৯
উদ্বোধন ... ১১
শেষদৃষ্টি ... ১৩
প্রায়শ্চিত্ত ... ১৫
বুদ্ধভক্তি ... ১৯
কেন ... ২১
হিন্দুস্থান ... ২৫
রাজপুতানা ... ২৭
ভাগ্যরাজ্য ... ৩১
ভূমিকম্প ... ৩৪
পক্ষীমানব ... ৩৭
আহ্বান ... ৪০
রাতের গাড়ি ... ৪১
মৌলানা জিয়াউদ্দীন ... ৪৩
অস্পষ্ট ... ৪৬
এপারে-ওপারে ... ৪৯
মংপু পাহাড়ে ... ৫৪
ইস্টেশন ... ৫৭
জবাবদিহি ... ৬১
সাড়ে নটা ... ৬৩
প্রবাসী ... ৬৬
জন্মদিন ... ৬৮
প্রশ্ন ... ৭০

রোম্যাণ্টিক ... ৭২
ক্যাঙ্গারু নাচ ... ৭৪
অবর্জিত ... ৭৬
শেষ হিসাব ... ৭৯
সন্ধ্যা ... ৮২
জয়ধ্বনি ... ৮৩
প্রজাপতি ... ৮৫
প্রবীণ ... ৮৮
রাত্রি ... ৯০
শেষবেলা ... ৯২
রূপ-বিরূপ ... ৯৪
শেষ কথা ... ৯৬

প্রথম ছত্রের সূচী

অভিভূত ধরণীর দীপ-নেভা তোরণদুয়ারে	...	৯০
আজি এ আঁখির শেষদৃষ্টির দিনে	...	১৩
আজি ফাল্গুনে দোলপূর্ণিমা রাত্রি	...	৪৬
আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরানো কালের যে প্রদেশ	...	৩১
আমারে বলে যে ওরা রোম্যাণ্টিক	...	৭২
আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব কিছু	...	৭৬
উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো	...	১৫
এ ঘরে ফুরালো খেলা	...	৯৬
এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি	...	৪১
এই ছবি রাজপুতানার	...	২৭
এই মোর জীবনের মহাদেশে	...	৯৪
এল বেলা পাতা ঝরাবারে	...	৯২
কখনো কখনো কোনো অবসরে	...	৬৩
কবি হয়ে দোল-উৎসবে	...	৬১
কুজ্‌ঝটিজাল যেই	...	৫৪
চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহুদূরে	...	৭০
চেনাশোনার সাঁঝবেলাতে	...	৭৯
জ্যোতিষীরা বলে	...	২১
তোমরা রচিলে যারে	...	৬৮
দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী	...	৮২
নবীন আগন্তুক	...	৯
প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে	...	১১
বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে	...	৪০

বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ	...	৮৮
মোরে হিন্দুস্থান	...	২৫
যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি	...	৩৭
যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে	...	৮৩
রাস্তার ওপারে	...	৪৯
সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি	...	৫৭
সকালে উঠেই দেখি	...	৮৫
সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে	...	৬৩
সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ	...	৭৪
হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতালদেশে	...	৩৪
হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য	...	১৯
হে প্রবাসী	...	৬৬

সূচনা

আমার কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।

কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার একশ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্নেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কী ভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারি নে। হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু, এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই নবজাতক গ্রন্থের কাব্যগ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম, কারণ দেশ-বিদেশের সাহিত্যে ব্যাপকক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।

উদয়ন
৪ এপ্রিল, ১৯৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবজাতক

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কী বার্তা নিয়ে মর্তে এসেছ তুমি ;
জীবনরঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমরলোকের কী গান এসেছ শুনে।
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম-তরে।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।

আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি—
আগামী প্রাতের শুকতারা-সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী—
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি বা দিতেছে আনি॥

শান্তিনিকেতন
১৯ অগস্ট, ১৯৩৮

উদ্বোধন

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে।
এসো এসো সেই নব সৃষ্টির কবি
নবজাগরণ-যুগপ্রভাতের রবি।
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশিরস্নানের কালে,
আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে॥

সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাও তাহারে আগমনীসংগীতে
যে জাগায় চোখে নূতন দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।
অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহব্যথা যে হানে
বিহ্বল প্রাতে সংগীতসৌরভে,
দূর-আকাশের অরুণিম উৎসবে॥

যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালি
মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী-ডালি।
জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্বজয়ী।
জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে,
বিশ্বজনের প্রাঙ্গনতলে লহো আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান॥

২৫ বৈশাখ, ১৩৪৫

শেষদৃষ্টি

আজি এ আঁখির শেষদৃষ্টির দিনে
ফাগুনবেলার ফুলের খেলার
দানগুলি লব চিনে।
দেখা দিয়েছিল মুখর প্রহরে
দিনের দুয়ার খুলি,
তাদের আভায় আজি মিলে যায়
রাঙা গোধূলির শেষতুলিকায়
ক্ষণিকের রূপ-রচনলীলায়
সন্ধ্যার রঙগুলি॥

যে অতিথিদেহে ভোরবেলাকার
রূপ নিল ভৈরবী,
অস্তরবির দেহলিদুয়ারে
বাঁশিতে আজিকে আঁকিল উহারে
মূলতানরাগে সুরের প্রতিমা
গেরুয়া রঙের ছবি॥

খনে খনে যত মর্মভেদিনী
বেদনা পেয়েছে মন

নিয়ে সে দুঃখ ধীর আনন্দে
বিষাদকরুণ শিল্পছন্দে
অগোচর কবি করেছে রচনা
মাধুরী চিরন্তন ॥

একদা জীবনে সুখের শিহর
নিখিল করেছে প্রিয়
মরণপরশে আজি কুন্ঠিত
অন্তরালে সে অবগুণ্ঠিত,
অদেখা আলোকে তাকে দেখা যায়
কী অনির্বচনীয় ॥

যা গিয়েছে তার অধরারূপের
অলখ পরশখানি
যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর,
দিক্‌সীমানার পারের সুদূর
কালের অতীত ভাষার অতীত
শুনায় দৈববাণী ॥

সেঁজুতি। শান্তিনিকেতন
১২ জানুয়ারি, ১৯৪০

প্রায়শ্চিত্ত

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন ॥

দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালীনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা ॥

নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।

পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হয়ে, তার
কলুষপুঞ্জ ক'রে দিক উদ্গার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা॥

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।

জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি ॥

ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা
ভীত প্রার্থনারবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া।
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।
শুধু বাণীকৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা ॥

সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে ॥

বিজয়াদশমী
১৩৪৫

বুদ্ধভক্তি

জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি, জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো॥

গর্জিয়া প্রার্থনা করে—
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ—

বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো॥

হত-আহতের গনি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস—
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো॥

শান্তিনিকেতন
৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮

কেন

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান-যজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে
যে-জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতিতুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।
কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু, কেন॥

তার পরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্যজগতে
ভেসে চলে সুখদুঃখ কল্পনাভাবনা কত পথে।

কোথাও বা জ্ব'লে ওঠে জীবন-উৎসাহ,
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিভে আসে নিঃস্বতার ভস্ম-অবশেষে।
নির্ঝর ঝরিছে দেশে দেশে—
লক্ষ্যহীন প্রাণস্রোত মৃত্যুর গহ্বরে ঢালে মহী
বাসনার বেদনার অজস্র বুদ্‌বুদপুঞ্জ বহি।
কে তার হিসাব রাখে লিখি।
নিত্য নিত্য এমনি কি
অফুরান আত্মহত্যা মানবসৃষ্টির
নিরন্তর প্রলয়বৃষ্টির
অশ্রান্ত প্লাবনে।
নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন॥

প্রথম বয়সে কবে ভাবনার কী আঘাত লেগে
এ প্রশ্নই মনে উঠেছিল জেগে—
শুধায়েছি, এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে

অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোল গর্জন,
ঝটিকার মন্দ্রস্বন,
দিবসনিশার
বেদনাবীণার তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার,
পূর্ণ করি ঋতুর উৎসব
জীবনের মরণের নিত্যকলরব,
আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত
নিয়ত স্পন্দিত করি দ্যুলোকের অন্তহীন রাত।
কল্পনায় দেখেছিনু, প্রতিধ্বনিমণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকন্দর-মাঝে।
সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা-মেলা ভাষা।
সেথা হতে পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি
সৃষ্টির আরম্ভবীজ লয় ভরি ভরি
আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা যত প্রতিধ্বনি।
অনুভব করেছি তখনি,
বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।
প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—

রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন?
কিন্তু, কেন॥

শান্তিনিকেতন
১২ অক্টোবর, ১৯৩৮

হিন্দুস্থান

মোরে হিন্দুস্থান
বারবার করেছে আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিমদিগন্ত-পানে,
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে,
কালে কালে
তাণ্ডবের তালে তালে,
দিল্লিতে আগ্রাতে
মঞ্জীরঝংকার আর দূর শকুনির ধ্বনি-সাথে ;
কালের মন্থনদণ্ডঘাতে
উচ্ছলি উঠেছে যেথা পাথরের ফেনস্তূপে
অদৃষ্টের অট্টহাস্য অভ্রভেদী প্রাসাদের রূপে।
লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর দুই বিপরীত পথে
রথে প্রতিরথে
ধূলিতে ধূলিতে যেথা পাকে পাকে করেছে রচনা
জটিল রেখার জালে শুভ-অশুভের আলপনা।
নব নব ধ্বজা হাতে নব নব সৈনিকবাহিনী
এক কাহিনীর সূত্র ছিন্ন করি আরেক কাহিনী
বারংবার গ্রন্থি দিয়ে করেছে যোজন।
প্রাঙ্গণপ্রাচীর যার অকস্মাৎ করেছে লঙ্ঘন
দস্যুদল,
অর্ধরাত্রে দ্বার ভেঙে জাগিয়েছে আর্ত কোলাহল,

করেছে আসন-কাড়াকাড়ি,
ক্ষুধিতের অন্নথালি নিয়েছে উজাড়ি।
রাত্রিরে ভুলিল তারা ঐশ্বর্যের মশাল-আলোয়—
পীড়িত পীড়নকারী দোঁহে মিলি সাদায় কালোয়
যেখানে রচিয়াছিল দ্যূতখেলাঘর,
অবশেষে সেথা আজ একমাত্র বিরাট কবর
প্রান্ত হতে প্রান্তে প্রসারিত ;
সেথা জয়ী আর পরাজিত
একত্রে করেছে অবসান
বহু শতাব্দীর যত মান অসম্মান।
ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,
বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের ॥

শান্তিনিকেতন
১৯ এপ্রিল, ১৯৩৭

রাজপুতানা

এই ছবি রাজপুতানার ;
এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার
দুর্বিষহ বোঝা।
হতবুদ্ধি অতীতের এই যেন খোঁজা
পথভ্রষ্ট বর্তমানে অর্থ আপনার,
শূন্যেতে হারানো অধিকার।
ঐ তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রূকুটি,
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি
বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে।
মৃত্যুতে করেছে গ্রাস তবুও যে মরিতে না জানে,
ভোগ করে অসম্মান অকালের হাতে
দিনে রাতে,
অসাড় অন্তরে
গ্লানি অনুভব নাহি করে,
আপনারি চাটুবাক্যে আপনারে ভুলায় আশ্বাসে—
জানে না সে,
পরিপূর্ণ কত শতাব্দীর পণ্যরথ
উত্তীর্ণ না হতে পথ
ভগ্নচক্র পড়ে আছে মরুর প্রান্তরে,
ম্রিয়মান আলোকের প্রহরে প্রহরে

বেড়িয়াছে অন্ধ বিভাবরী
নাগপাশে ; ভাষাভোলা ধূলির করুণা লাভ করি
একমাত্র শান্তি তাহাদের।
লঙ্ঘন যে করে নাই ভোলামনে কালের বাঁধের
অন্তিম নিষেধসীমা—
ভগ্নস্তূপে থাকে তার নামহীন প্রচ্ছন্ন মহিমা ;
জেগে থাকে কল্পনার ভিতে
ইতিবৃত্তহারা তার ইতিহাস উদার ইঙ্গিতে।
কিন্তু এ নির্লজ্জ কারা ! কালের উপেক্ষাদৃষ্টি-কাছে
না থেকেও তবু আছে।
একি আত্মবিস্মরণমোহ,
বীর্যহীন ভিত্তি-'পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।
রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা,
বিধাতার সাজা ॥

হোথা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস,
ওরা কভু আধামিথ্যা রূপে
সত্যেরে তো হানে না বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে ;
দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্তমূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে

এদিকে চাহিয়া দেখো টিটাগড়।
লোষ্ট্রে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাখীর পণ্যঝড়।
বণিকের দম্ভে নাই বাধা,
আসমুদ্র পৃথ্বীতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ন মর্যাদা।
প্রয়োজন নাহি জানে ওরা
ভূষণে সাজায়ে হাতিঘোড়া
সম্মানের ভান করিবার,
ভুলাইতে ছদ্মবেশী সমুচ্চ তুচ্ছতা আপনার।
শেষের পঙ্‌ক্তিতে যবে থামিবে ওদের ভাগ্যলিখা,
নামিবে অন্তিম যবনিকা,
উত্তাল রজতপিণ্ড-উদ্ধারের শেষ হবে পালা,
যন্ত্রের কিঙ্করগুলো নিয়ে ভস্মডালা
লুপ্ত হবে নেপথ্যে যখন,
পশ্চাতে যাবে না রেখে প্রেতের প্রগল্‌ভ প্রহসন॥

উদাত্ত যুগের রথে বল্গাধরা সে রাজপুতানা
মরুপ্রস্তরের স্তরে একদিন দিল মুষ্টি হানা;
তুলিল উদ্ভেদ করি কলোল্লোলে মহা-ইতিহাস
প্রাণে উচ্ছ্বসিত, মৃত্যুতে ফেনিল; তারি তপ্তশ্বাস
স্পর্শ দেয় মনে, রক্ত উঠে আবর্তিয়া বুকে—
সে যুগের সুদূর সম্মুখে
স্তব্ধ হয়ে ভুলি, এই কৃপণ কালের দৈন্যপাশে-
জর্জরিত, নতশির অদৃষ্টের অট্টহাসে,

গলবদ্ধ পশুশ্রেণীসম চলে দিন পরে দিন
লজ্জাহীন।
জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব-মাঝে
সেদিন যে দুন্দুভি মন্দ্রিয়াছিল, তার প্রতিধ্বনি বাজে
প্রাণের কুহরে গুমরিয়া। নির্ভয় দুর্দান্ত খেলা,
মনে হয়, সেই তো সহজ, দূরে নিক্ষেপিয়া ফেলা
আপনারে নিঃসংশয় নিষ্ঠুর সংকটে। তুচ্ছ প্রাণ
নহে তো সহজ ; মৃত্যুর বেদিতে যার কোনো দান
নাই কোনো কালে সেই তো দুর্ভর অতি,
আপনার সঙ্গে নিত্য বাল্যপনা দুঃসহ দুর্গতি।
প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্পে রচে অলস কল্পনা
নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা,
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীরসাজে
তারস্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্ লাজে।
তাই ভাবি হে রাজপুতানা,
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক ;
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।
শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে॥

মংপু
২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

ভাগ্যরাজ্য

আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরানো কালের যে প্রদেশ,
আয়ুহারাদের ভগ্নশেষ
সেথা পড়ে আছে
পূর্বদিগন্তের কাছে।
নিঃশেষ করেছে মূল্য সংসারের হাটে,
অনাবশ্যকের ভাঙা ঘাটে
জীর্ণ দিন কাটাইছে তারা
অর্থহারা।
ভগ্ন গৃহে লগ্ন ঐ অর্ধেক প্রাচীর ;
আশাহীন পূর্ব আসক্তির
কাঙাল শিকড়জাল
বৃথা আঁকড়িয়া ধরে প্রাণপণে বর্তমান কাল।
আকাশে তাকায় শিলালেখ,
তাহার প্রত্যেক
অস্পষ্ট অক্ষর আজ পাশের অক্ষরে
ক্লান্ত সুরে প্রশ্ন করে,
"আরো কি রয়েছে বাকি কোনো কথা,
শেষ হয়ে যায় নি বারতা।"

এ আমার ভাগ্যরাজ্যে অন্যত্র হোথায় দিগন্তরে
অসংলগ্ন ভিত্তি-'পরে

করে আছে চুপ
অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষার অসম্পূর্ণ রূপ।
অকথিত বাণীর ইঙ্গিতে
চারিভিতে
নীরবতা-উৎকণ্ঠিত মুখ
রয়েছে উৎসুক।
একদা যে যাত্রীদের সংকল্পে ঘটেছে অপঘাত,
অন্য পথে গেছে অকস্মাৎ,
তাদের চকিত আশা,
স্থকিত চলার স্তব্ধ ভাষা
জানায়, হয় নি চলা সারা—
দুরাশার দূরতীর্থ আজো নিত্য করিছে ইশারা।
আজিও কালের সভা-মাঝে
তাদের প্রথম সাজে
পড়ে নাই জীর্ণতার দাগ,
লক্ষ্যচ্যুত কামনায় রয়েছে আদিম রক্তরাগ।
কিছু শেষ করা হয় নাই,
হেরো, তাই
সময় যে পেল না নবীন
কোনোদিন
পুরাতন হতে—
শৈবালে ঢাকে নি তারে বাঁধা-পড়া ঘাটে-লাগা স্রোতে ;

স্মৃতির বেদনা কিছু, কিছু পরিতাপ,
কিছু অপ্রাপ্তির অভিশাপ
তারে নিত্য রেখেছে উজ্জ্বল ;
না দেয় নীরস হতে মজ্জাগত গুপ্ত অশ্রুজল।
যাত্রাপথ-পাশে
আছ তুমি আধো-ঢাকা ঘাসে—
পাথরে খুদিতেছিনু, হে মূর্তি, তোমারে কোন্ ক্ষণে
কিসের কল্পনে।
অপূর্ণ তোমার কাছে পাই না উত্তর।
মনে যে কী ছিল মোর
যেদিন ফুটিত তাহা শিল্পের সম্পূর্ণ সাধনাতে
শেষ-রেখাপাতে,
সেদিন তা জানিতাম আমি ;
তার আগে চেষ্টা গেছে থামি।
সেই শেষ না-জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্ম-মাঝে রয়েছে আমার ;
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি ॥

ভূমিকম্প

হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতালদেশে
অন্ধ রিপু লুকিয়ে ছিল ছদ্মবেশে—
সোনার পুঞ্জ যেথায় রাখ,
আঁচলতলে যেথায় ঢাক
কঠিন লৌহ, মৃত্যুদূতের চরণধূলির
পিণ্ড তারা, খেলা জোগায়
যমালয়ের ডাণ্ডাগুলির ॥

উপর তলায় হাওয়ার দোলায় নবীন ধানে
ধানশ্রীসুর মূর্ছনা দেয় সবুজ গানে।
দুঃখে সুখে স্নেহে প্রেমে
স্বর্গ আসে মর্তে নেমে,
ঋতুর ডালি ফুল-ফসলের অর্ঘ্য বিলায়,
ওড়না রাঙে ধূপছায়াতে
প্রাণনটিনীর নৃত্যলীলায় ॥

অন্তরে তোর গুপ্ত যে পাপ রাখলি চেপে
তার ঢাকা আজ স্তরে স্তরে উঠল কেঁপে।

যে বিশ্বাসের আবাসখানি
ধ্রুব ব'লেই সবাই জানি
একনিমেষে মিশিয়ে দিলি ধূলির সাথে,
প্রাণের দারুণ অবমানন
ঘটিয়ে দিলি জড়ের হাতে ॥

বিপুল প্রতাপ থাক্-না যতই বাহির দিকে
কেবল সেটা স্পর্ধাবলে রয় না টিঁকে।
দুর্বলতা কুটিল হেসে
ফাটল ধরায় তলায় এসে
হঠাৎ কখন দিগ্‌ব্যাপিনী কীর্তি যত
দর্পহারীর অট্টহাস্যে
যায় মিলিয়ে স্বপ্নমতো ॥

হে ধরণী, এই ইতিহাস সহস্রবার
যুগে যুগে উদ্ঘাটিলে সামনে সবার।
জাগল দম্ভ বিরাট রূপে,
মজ্জায় তার চুপে চুপে
লাগল রিপুর অলক্ষ্য বিষ সর্বনাশা—
রূপক নাট্যে ব্যাখ্যা তারি
দিয়েছ আজ ভীষণ ভাষায় ॥

যে যথার্থ শক্তি সে তো শান্তিময়ী,
সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।
অশক্তি তার আসন পেতে
ছিল তোমার অন্তরেতে—
সেই তো ভীষণ, নিষ্ঠুর তার বীভৎসতা,
নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাহীন
তাই সে এমন হিংসারতা॥

৬ই চৈত্র, ১৩৪০

পক্ষীমানব

যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি।
স্থল জল যত তার পদানত
আকাশ আছিল বাকি॥

বিধাতার দান পাখিদের ডানাছুটি।
রঙের রেখায় চিত্রলেখায়
আনন্দ উঠে ফুটি ;
তারা যে রঙিন পান্থ মেঘের সাথি।
নীল গগনের মহাপবনের
যেন তারা একজাতি।
তাহাদের লীলা বায়ুর ছন্দে বাঁধা ;
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান
আকাশের সুরে সাধা ;
তাই প্রতিদিন ধরণীর বনে বনে
আলোক জাগিলে একতানে মিলে
তাহাদের জাগরণে।
মহাকাশতলে যে মহাশান্তি আছে
তাহাতে লহরী কাঁপে থরথরি
তাদের পাখার নাচে॥

যুগে যুগে তারা গগনের পথে পথে
জীবনের বাণী দিয়েছিল আনি

অরণ্যে পর্বতে ;
আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে।
স্পর্ধা পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।
তারে প্রাণদেব করে নি আশীর্বাদ।
তাহারে আপন করে নি তপন,
মানে নি তাহারে চাঁদ।
আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি
কর্কশস্বরে গর্জন করে
বাতাসেরে জর্জরি।
আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে
হানিছে অট্টহাসে।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে—
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে ;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।
দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,

এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে ॥

আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন—
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন ॥

২৫ ফাল্গুন, ১৩৩৮

আহ্বান

কানাডার প্রতি

বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,
যুগযুগের তাপসদের সাধনধন যত
দানবপদদলনে হল গুঁড়া।
তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে,
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।
রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।
ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়
অসম্মান নিয়ো না শিরে, ভুলো না আপনায়।
মিথ্যা দিয়ে, চাতুরী দিয়ে, রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে কোরো না পরিহাস।
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
বলীর পদে দুর্বলেরে কোরো না বলিদান॥

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা
১ এপ্রিল, ১৯৩৯

রাতের গাড়ি

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি,
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়িভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।
অসীম আঁধারে
কালি-লেপা কিছু-নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে রয়েছে সে
পরিচয়হারা দেশে।
ক্ষণ-আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়,
অদৃশ্য ঠিকানায়।
অতিদূর-তীর্থের যাত্রী,
ভাষাহীন রাত্রি,
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ।
চালায় যে নাম নাহি কয়;
কেউ বলে, যন্ত্র সে আর কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।

বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়,
তারি যেন বহে নিশ্বাস,
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে,
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে॥

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
২৮ মার্চ, ১৯৪০

মৌলানা জিয়াউদ্দীন

কখনো কখনো কোনো অবসরে
নিকটে দাঁড়াতে এসে;
'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে,
'বোসো' বলিতাম হেসে।
দু-চারটে হত সামান্য কথা,
ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
হাসিতামাশার পিছু।
কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়,
অকথিত কত বাণী,
চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন
আজিকে সে কথা জানি।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
সামান্য যাওয়া-আসা,
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
খুঁজে নাহি পাই ভাষা॥

তব জীবনের বহু সাধনার
যে পণ্যভার ভরি

মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
তোমার নবীন তরী,
যেমনি তা হোক মনে জানি তার
এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
আপন নিত্য ঠাঁই—
সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্‌কার প্রাণে—
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনোখানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ বা প্রজার সুহৃদ্‌ সহায়,
কেহ বা রাজার জ্ঞাতি—
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দমহিমায়

আপনার দান নিঃশেষ করি
ধুলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারিপাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভনিশ্বাসে ॥

শান্তিনিকেতন
৮ জুলাই, ১৯৩৮

অস্পষ্ট

আজি ফাল্গুনে দোলপূর্ণিমারাত্রি,
উপছায়া-চলা বনে বনে মন
'আবছা পথের যাত্রী।
ঘুম-ভাঙানিয়া জোছনা—
কোথা থেকে যেন আকাশে কে বলে,
'একটুকু কাছে বোসো না।'
ফিস্‌ফিস্ করে পাতায় পাতায়,
উস্‌খুস্ করে হাওয়া।
ছায়ার আড়ালে গন্ধরাজের
তন্দ্রাজড়িত চাওয়া।
চন্দনিদহে থই থই জল
ঝিক্‌ঝিক্ করে আলোতে,
জামরুলগাছে ফুলকাটা কাজে
বুনুনি সাদায় কালোতে।
প্রহরে প্রহরে রাজার ফটকে
বহুদূরে বাজে ঘণ্টা।
জেগে উঠে বসে ঠিকানা-হারানো
শূন্য-উধাও মনটা।
বুঝিতে পারি নে কত কী শব্দ—
মনে হয় যেন ধারণা,

রাতের বুকের ভিতরে কে করে
অদৃশ্য পদচারণা।
গাছগুলো সব ঘুমে ডুবে আছে,
তন্দ্রা তারায় তারায়,
কাছের পৃথিবী স্বপ্নপ্লাবনে
দূরের প্রান্তে হারায়।
রাতের পৃথিবী ভেসে উঠিয়াছে
বিধির নিশ্চেতনায়,
আভাষ আপন ভাষার পরশ
খোঁজে সেই আনমনায়।
রক্তের দোলে যে-সব বেদনা
স্পষ্ট বোধের বাহিরে
ভাবনাপ্রবাহে বুদ্‌বুদ তারা,
স্থির পরিচয় নাহি রে।
প্রভাত-আলোক আকাশে আকাশে
এ চিত্র দিবে মুছিয়া,
পরিহাসে তার অবচেতনার
বঞ্চনা যাবে ঘুচিয়া।
চেতনার জালে এ মহাগহনে
বস্তু যা-কিছু টিঁকিবে,
সৃষ্টি তারেই স্বীকার করিয়া
স্বাক্ষর তাহে লিখিবে।
তবু কিছু মোহ, কিছু কিছু ভুল
জাগ্রত সেই প্রাপণার

প্রাণতন্তুতে রেখায় রেখায়
রঙ রেখে যাবে আপনার।
এ জীবনে তাই রাত্রির দান
দিনের রচনা জড়ায়ে
চিন্তা-কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব
রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে।
বুদ্ধি যাহারে মিছে বলে হাসে
সে যে সত্যের মূলে
আপন গোপন রসসঞ্চারে
ভরিছে ফসলে ফুলে।
অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে
ফেলিছে রঙিন ছায়া—
বাস্তব যত শিকল গড়িছে,
খেলেনা গড়িছে মায়া ॥

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
২৭ মার্চ, ১৯৪০

এপারে-ওপারে

রাস্তার ওপারে
বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি সারে সারে।
ওখানে সবাই আছে
ক্ষীণ যত আড়ালের আড়ে-আড়ে কাছে-কাছে।
যা-খুশি প্রসঙ্গ নিয়ে
ইনিয়ে-বিনিয়ে
নানা কণ্ঠে বকে যায় কলস্বরে।
অকারণে হাত ধরে ;
যে যাহারে চেনে
পিঠেতে চাপড় দিয়ে নিয়ে যায় টেনে
লক্ষ্যহীন অলিতে গলিতে,
কথা-কাটাকাটি চলে গলাগলি চলিতে চলিতে।
বৃথাই কুশলবার্তা জানিবার ছলে
প্রশ্ন করে বিনা কৌতূহলে।
পরস্পরে দেখা হয়,
বাঁধা ঠাট্টা করে বিনিময়।
কোথা হতে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে
হেসে ওঠে অহেতু কৌতুকে।
'আনন্দবাজার' হতে সংবাদ-উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে
ছুটির মধ্যাহ্নবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে।

সিনেমা-নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে
রূপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে,
উত্তাপ প্রবল হয় শেষে
বন্ধুবিচ্ছেদের কাছে এসে।
পথপ্রান্তে দ্বারের সম্মুখে বসি
ফেরিওয়ালাদের সাথে হুঁকো-হাতে দর-কষাকষি।
একই সুরে দম দিয়ে বারবার
গ্রামোফোনে চেষ্টা চলে থিয়েটরি গান শিখিবার।
কোথাও কুকুরছানা ঘেউ-ঘেউ আদরের ডাকে
চমক লাগায় বাড়িটাকে।
শিশু কাঁদে মেঝে মাথা হানি,
সাথে চলে গৃহিণীর অসহিষ্ণু তীব্র ধমকানি।
তাসপিটোনির শব্দ, নিয়ে জিত হার
থেকে থেকে বিষম চীৎকার।
যেদিন ট্যাক্সিতে চ'ড়ে জামাই উদয় হয় আসি
মেয়েতে মেয়েতে হাসাহাসি,
টেপাটেপি, কানাকানি,
অঙ্গরাগে লাজুকেরে সাজিয়ে দেবার টানাটানি।
দেউড়িতে ছাতে বারান্দায়
নানাবিধ আনাগোনা ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলে যায়॥

হেথা দ্বার বন্ধ হয় হোথা দ্বার খোলে,
দড়িতে গামছা ধুতি ফর্‌ফর্‌ শব্দ করি ঝোলে।

অনির্দিষ্ট ধ্বনি চারি পাশে
দিনে রাত্রে কাজের আভাসে।
উঠোনে অনবধানে-খুলে-রাখা কলে
জল বহে যায় কলকলে ;
সিঁড়িতে আসিতে যেতে
রাত্রিদিন পথ স্যাঁত্‌সেঁতে।
বেলা হলে ওঠে ঝন্‌ঝনি
বাসনমাজার ধ্বনি।
বেড়ি হাতা খুন্তি রান্নাঘরে
ঘরকরনার সুরে ঝংকার জাগায় পরস্পরে।
কড়ায় সর্ষের তেল চিড়্‌বিড়্‌ ফোটে,
তারি মধ্যে কইমাছ অকস্মাৎ ছ্যাঁক্ করে ওঠে।
বন্দেমাতরম্-পেড়ে শাড়ি নিয়ে তাঁতিবউ ডাকে
বউমাকে।
খেলার ট্রাইসিকেলে
ছড়্‌খড়্‌ খড়্‌খড়্‌ আঙিনায় ঘোরে কার ছেলে।
যাদের উদয় অস্ত আপিসের দিক্‌চক্রবালে
তাদের গৃহিণীদের সকালে বিকালে
দিন পরে দিন যায়
দুইবার জোয়ারভাঁটায়
ছুটি আর কাজে।
হোথা পড়ামুখস্থের একঘেয়ে অশ্রান্ত আওয়াজে
ধৈর্য হারাইছে পাড়া,
এগ্‌জামিনেশনে দেয় তাড়া॥

প্রাণের প্রবাহে ভেসে
বিবিধ ভঙ্গীতে ওরা মেশে।
চেনা ও অচেনা
লঘু আলাপের ফেনা
আবর্তিয়া তোলে
দেখাশোনা আনাগোনা গতির হিল্লোলে।
রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ দুপুরে
জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে
জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি,
সারাদিন চলেছে সন্ধান
দুরূহের ব্যর্থ সমাধান।
মনের ধূসর কূলে
প্রাণের জোয়ার মোরে একদিন দিয়ে গেছে তুলে।
চারি দিকে তীক্ষ্ণ আলো ঝক্ঝক্ করে
রিক্তরস উদ্দীপ্ত প্রহরে।
ভাবি এই কথা—
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে।
কিছু তার টেঁকে নাকো দীর্ঘকাল,
মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল
ছন্দটারে তার
বদল করিছে বারংবার।

তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণেক্ষণ
ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি
সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।
আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

পুরী
২০ বৈশাখ, ১৩৪৬

মংপু পাহাড়ে

কুজ্‌ঝটিজাল যেই
সরে গেল মংপু-র
নীল শৈলের গায়ে
দেখা দিল রঙপুর।
বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার,
আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর-পানে ধ্যানে চাই যদ্দুর।
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এল গেল, ম'ল এরি মধ্যে,
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে।
কত মাথা-কাটাকাটি সভ্যে-অসভ্যে,
কত মাথা-ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে।
ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য-উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ঐ ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরি 'পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নিচে রেখা দেখা যায় ঐ নদী তিস্তার,
কঠোরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।

হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে
টানাপাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে

রবিঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর,
আজি তো বয়স তার কেবল আটাত্তর—
সাতের পিঠের কাছে একফোঁটা শূন্য,
শত শত বরষের ওদের তারুণ্য।
ছোটো আয়ু মানুষের, তবু একি কাণ্ড,
এটুকু সীমায় গড়া মনোব্রহ্মাণ্ড—
কত সুখে দুখে গাঁথা, ইষ্টে অনিষ্টে,
সুন্দরে কুৎসিতে, তিক্তে ও মিষ্টে,
কত গৃহ-উৎসবে, কত সভাসজ্জায়,
কত রসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়,
ভাষার-নাগাল-ছাড়া কত উপলব্ধি,
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তার স্তব্ধি।
অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি
অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি,
এত মধু-অঞ্জনে রঞ্জিত দৃষ্টি।
বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য,
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছুমাত্র,
আমারই কী লোকসান যদি হই শূন্য—
শেষক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ন।

এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য,
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সন্থ,
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অন্থ
জাগ্রত রবে চিরদিবসের জন্মে
এই গিরিতটে এই নীলিম অরণ্যে।
তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি—
বারবার ঢাকা দেওয়া, বারবার মুক্তি।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি—
উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি॥

মংপু
১০ জুন, ১৯৩৮

ইস্‌টেশন

সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে
কেউ বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ বা থাকে বসে,
কেউ বা গাড়ি ফেল্ করে তার
শেষ-মিনিটের দোষে।

দিনরাত গড়্‌গড়্ ঘড়্‌ঘড়্,
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়।
ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে
কভু পশ্চিমে, কভু পূর্বে॥

চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্যমেলার নিত্যভোলার ভাষা-
কেবল যাওয়া-আসা।
মঞ্চতলে দণ্ডে পলে
ভিড় জমা হয় কত—

পতাকাটা দেয় দুলিয়ে,
কে কোথা হয় গত।
এর পিছনে সুখদুঃখ
ক্ষতিলাভের তাড়া
দেয় সবলে নাড়া।

সময়ের ঘড়িধরা অঙ্কেতে
ভোঁ ভোঁ ক'রে বাঁশি বাজে সংকেতে।
দেরি নাহি সয় কারো কিছুতেই—
কেহ যায়, কেহ থাকে পিছুতেই॥

ওদের চলা ওদের পড়ে-থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে
কেবল ছবি আঁকায়।
খানিকক্ষণ যা চোখে পড়ে
তার পরে যায় মুছে,
আত্ম-অবহেলার খেলা
নিত্যই যায় ঘুচে।
ছেঁড়া পটের টুকরো জমে
পথের প্রান্ত জুড়ে,
তপ্তদিনের ক্লান্ত হাওয়ায়
কোন্‌খানে যায় উড়ে।

'গেল গেল' ব'লে যারা
ফুকরে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক পরে কান্না-সমেত
তারাই পিছে ছোটে।

ঢং ঢং বেজে ওঠে ঘণ্টা,
এসে পড়ে বিদায়ের ক্ষণটা।
মুখ রাখে জানলায় বাড়িয়ে,
নিমেষেই নিয়ে যায় ছাড়িয়ে॥

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি—
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি
কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা—
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়,
দেখার জিনিস এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল,
হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
দুবেলা সেই এ সংসারের
চলতি ছবি দেখা,
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার
ইস্টেশনে একা॥

এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়,
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।
আসে কারা এক দিক হতে ঐ,
ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে ঐ ॥

শান্তিনিকেতন
৭ জুলাই, ১৯৩৮

জবাবদিহি

কবি হয়ে দোল-উৎসবে
কোন্ লাজে কালো সাজে আসি,
এ নিয়ে রসিকা তোরা সবে
করেছিলি খুব হাসাহাসি।
চৈত্রের দোল-প্রাঙ্গণে
আমার জবাবদিহি চাই
এ দাবি তোদের ছিল মনে,
কাজ ফেলে আসিয়াছি তাই।

দোলের দিনে, সে কী মনের ভুলে,
পরেছিলাম যখন কালো কাপড়,
দখিন হাওয়া দুয়ারখানা খুলে
হঠাৎ পিঠে দিল হাসির চাপড়।
সকল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি
কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগালো বুঝি
শেষ প্রহরে রঙহরণের পালা॥

ওরে কবি, ভয় কিছু নেই তোর—
কালো রঙ যে সকল রঙের চোর।

জানি যে ওর বক্ষে রাখে তুলি
হারিয়ে-যাওয়া পূর্ণিমা ফাল্গুনী—
অস্তরবির রঙের কালো ঝুলি,
রসের শাস্ত্রে এই কথা কয় শুনি।
অন্ধকারে অজানা-সন্ধানে
অচিন লোকে সীমাবিহীন রাতে
রঙের তৃষা বহন করি প্রাণে
চলব যখন তারার ইশারাতে,
হয়তো তখন শেষ-বয়সের কালো
করবে বাহির আপন গ্রন্থি খুলি
যৌবনদীপ— জাগাবে তার আলো
ঘুমভাঙা সব রাঙা প্রহরগুলি।
কালো তখন রঙের দীপালিতে
সুর লাগাবে বিস্মৃত সংগীতে॥

উদয়ন
২৮ মার্চ, ১৯৪০

সাড়ে নটা

সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে ;
সকালের মৃদু শীতে
তন্দ্রাবেশে হাওয়া যেন রোদ পোহাইছে
পাহাড়ের উপত্যকা-নিচে
বনের মাথায়
সবুজের আমন্ত্রণ-বিছানো পাতায়।
বৈঠকখানার ঘরে রেডিয়োতে
সমুদ্রপারের দেশ হতে
আকাশে প্লাবন আনে সুরের প্রবাহে,
বিদেশিনী বিদেশের কণ্ঠে গান গাহে
বহু যোজনের অন্তরালে।
সব তার লুপ্ত হয়ে মিলেছে কেবল সুরে তালে।
দেহহীন পরিবেশহীন
গীতস্পর্শ হতেছে বিলীন
সমস্ত চেতনা ছেয়ে।
যে বেলাটি বেয়ে
এল তার সাড়া
সে আমার দেশের সময়-সূত্র-ছাড়া।
একাকিনী, বহি রাগিণীর দীপশিখা
আসিছে অভিসারিকা

সর্বভারহীনা ;
অরূপা সে, অলক্ষিত আলোকে আসীনা।
গিরিনদীসমুদ্রের মানে নি নিষেধ,
করিয়াছে ভেদ
পথে পথে বিচিত্র ভাষার কলরব,
পদে পদে জন্ম-মৃত্যু বিলাপ-উৎসব।
রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি,
লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি,
সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার।
বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সংগীতের ধারা।
যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত।
বাণীমূর্তি সেও একা।
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা।
তার পাশে চুপ
সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ।
সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল
জীবনে উচ্ছল
ওর মাঝে তার কোনো আলো পড়ে নাই
রাজার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই।

যুগ যুগ হয়ে এল পার
কালের বিপ্লব বেয়ে, কোনো চিহ্ন আনে নাই তার।
বিপুল বিশ্বের মুখরতা
উহার শ্লোকের পটে স্তব্ধ করে দিল সব কথা॥

মংপু
৮ জুন, ১৯৩৯

প্রবাসী

হে প্রবাসী,
আমি কবি যে বাণীর প্রসাদ-প্রত্যাশী
অন্তরতমের ভাষা
সে করে বহন। ভালোবাসা
তারি পক্ষে ভর করি নাহি জানে দূর।
রক্তের নিঃশব্দ সুর
সদা চলে নাড়ীতন্তু বেয়ে,
সেই সুর যে ভাষার শব্দে আছে ছেয়ে
বাণীর অতীতগামী তাহারি বাণীতে
ভালোবাসা আপনার গূঢ় রূপ পারে যে জানিতে।
হে বিষয়ী, হে সংসারী, তোমরা যাহারা
আত্মহারা,
যারা ভালোবাসিবার বিশ্বপথ
হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ,
রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে
বিরহের ব্যথা নেই মনে।
আমি কবি পাঠালেম তোমাদের উদ্‌ভ্রান্ত পরানে
সে ভাষার দৌত্য যাহা হারানো নিজেরে কাছে আনে,
ভেদ করি মরুকারা
শুষ্ক চিত্তে নিয়ে আসে বেদনার ধারা।

বিস্মৃতি দিয়েছে তাহে ঘের
আজন্মকালের যাহা নিত্যদান চিরসুন্দরের—
তারে আজ লও ফিরে।
লক্ষ্মীর মন্দিরে
আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ ;
জানায়েছি, সেথাকার তোমার আসন
অন্যমনে তুমি আছ ভুলি।
জড় অভ্যাসের ধূলি
আজি নববর্ষে পুণ্যক্ষণে
যাক উড়ে, তোমার নয়নে
দেখা দিক্— এ ভুবনে সর্বত্রই কাছে আসিবার
তোমার আপন অধিকার॥

সুদূরের মিতা,
মোর কাছে চেয়েছিলে নূতন কবিতা।
এই লও বুঝে,
নূতনের স্পর্শমন্ত্র এর ছন্দে পাও যদি খুঁজে॥

জন্মদিন

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা
বিধাতার সৃষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে ॥

কালসমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে।
বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া,
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।
সংসারখেলার কক্ষে তাঁর
যে-খেলেনা রচিলেন মূর্তিকার

মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে,
সাদায় কালোতে,
কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর
কালের চাকার নিচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।
সে বহিয়া এনেছে যে দান
সে করে ক্ষণেকতরে অমরের ভান—
সহসা মুহূর্তে দেয় ফাঁকি,
মুঠি-কয় ধূলি রয় বাকি,
আর থাকে কালরাত্রি সব-চিহ্ন-ধুয়ে-মুছে-ফেলা।
তোমাদের জনতার খেলা
রচিল যে পুতুলিরে
সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে
এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে।
এ কথা কল্পনা কর যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখিকোণে,
সে কথাই ভাবি আজ মনে॥

পুরী
২৫ বৈশাখ, ১৩৪৬

প্রশ্ন

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহুদূরে,
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে॥

আপনার পানে চাই,
লেশমাত্র পরিচয় নাই।
এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বহুযুগে বহুদূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার,
যেন বাষ্পপরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।
সুখদুঃখ ভালোমন্দ রাগদ্বেষ ভক্তি সখ্য স্নেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ;
এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,
পুঞ্জিত, নর্তিত।

এরা সত্য কী যে
বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া
যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।
তার পরে ভাবি,
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্বপ্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষকথা
আত্মার বারতা।
তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ-মাঝে,
কিছুই জানি না কোন্ কাজে।
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর॥

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮

রোম্যাণ্টিক

আমারে বলে যে ওরা রোম্যাণ্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রঙ লাগায়েছি, প্রিয়ে।
দুয়ার-বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।
বসন্তবনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃদুস্বরে,
ছন্দ তাহে থাকে,
তার ফাঁকে ফাঁকে
শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি—
তাই শুনি
নেশা লাগে তোমার হাসিতে।
আমার বাঁশিতে
যখন আলাপ করি মুলতান
মনের রহস্য নিজ রাগিণীর পায় যে সন্ধান।
যে-কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই—

আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,
আনি তাঁরি যাদুর পরশ।
জানি, তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক?'
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক।'
যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি— সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম;
সেথায় নির্মম কর্ম;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ';
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে-হাতে॥

ক্যাণ্ডীয় নাচ

সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ ;
শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ
পেরিয়ে এল মুক্তিমাতাল খ্যাপা,
হুংকার তার ছুটল আকাশ-ব্যাপা।
ডালপালা সব দুড় দাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে—
নহে, নহে, নহে—
নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন-ফেরা,
নহে আবেগ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা,
নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন-
আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন।
ওদের ডেকে বলেছিল সমুদ্দরের ঢেউ,
'আমার ছন্দ রক্তে আছে এমন আছে কেউ।'
ঝঞ্ঝা ওদের বলেছিল, 'মঞ্জীর তোর আছে
ঝংকারে যার লাগাবে লয় আমার প্রলয়নাচে।'
ঐ যে পাগল দেহখানা, শূন্যে ওঠে বাহু,
যেন কোথায় হাঁ করেছে রাহু—
লুব্ধ তাহার ক্ষুধার থেকে চাঁদকে করবে ত্রাণ,
পূর্ণিমাকে ফিরিয়ে দেবে প্রাণ।
মহাদেবের তপোভঙ্গে যেন বিষম বেগে
নন্দী উঠল জেগে ;

শিবের ক্রোধের সঙ্গে
উঠল জ্বলে দুর্দাম তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
নাচের বহ্নিশিখা
নির্দয়া নির্ভীকা।
খুঁজতে ছোটে মোহমদের বাহন কোথায় আছে
দাহন করবে এই নিদারুণ আনন্দময় নাচে।
নটরাজ যে পুরুষ তিনি, তাণ্ডবে তাঁর সাধন,
আপন শক্তি মুক্ত ক'রে ছেঁড়েন আপন বাঁধন ;
দুঃখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয় ;
জয়ের নৃত্যে আপনাকে তাঁর জয়॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

অবর্জিত

আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু
চিরকাল মনে রাখিবে, এমন কিছু—
মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।
ধুলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধুলো,
চুকে গিয়ে তবু বাকি রবে যতগুলো
গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে।
আমি শুধু ভাবি, নিজেরে কেমনে ক্ষমি—
পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠেছে জমি,
কোন্ সংকারে করি তার সদ্‌গতি।
কবির গর্ব নেই মোর হেন নয়—
কবির লজ্জা পাশাপাশি তারই রয়,
ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি।
লিখিতে লিখিতে কেবলই গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যেজন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে
বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি

চারিদিক হতে গর্জন করি উঠে,
"ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে,
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।"
ইতিহাস বুড়ো, বেড়াজাল তার পাতা,
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা—
ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলই আছে।
হয় আর নয়, খোঁজ রাখে শুধু এই,
ভালোমন্দর দরদ কিছুই নেই,
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।
বিধাতাপুরুষ ঐতিহাসিক হলে
চেহারা লইয়া ঋতুরা পড়িত গোলে,
অঘ্রান তবে ফাগুন রহিত ব্যেপে।
পুরানো পাতারা ঝরিতে যাইত ভুলে,
কচি পাতাদের আঁকড়ি রহিত ঝুলে,
পুরাণ ধরিত কাব্যের টুঁটি চেপে।
জোড়হাত করে আমি বলি, "শোনো কথা,
সৃষ্টির কাজে প্রকাশেরই ব্যগ্রতা,
ইতিহাসটারে গোপন করে সে রাখে।
জীবনলক্ষ্মী মেলিয়া রঙের রেখা
ধরার অঙ্গে আঁকিছে পত্রলেখা,
ভূতত্ত্ব তার কঙ্কালে ঢাকা থাকে।
বিশ্বকবির লেখা যত হয় ছাপা
প্রুফ্‌শিটে তার দশগুণ পড়ে চাপা,

নব এডিশনে নূতন করিয়া তুলে।
দাগি যাহা, যাহে বিকার, যাহাতে ক্ষতি
মমতামাত্র নাহি তো তাহার প্রতি,
বাঁধা নাহি থাকে ভুলে আর নির্ভুলে।
সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা—
জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণপাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।
যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবই,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি—
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক;
কিন্তু, হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।
ভাবী কালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে,
খ্যাতিধারা মোর কত দূর চলে যাবে,
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি।
বর্তমানের ভরি অর্ঘ্যের ডালি
অদেয় যা দিনু মাখায়ে ছাপার কালি
তাহারই লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি॥

চন্দননগর
৫ জুন, ১৯৩৫

শেষ হিসাব

চেনাশোনার সাঁঝবেলাতে
শুনতে আমি চাই
পথে পথে চলার পালা
লাগল কেমন ভাই।
দুর্গম পথ ছিল ঘরেই,
বাইরে বিরাট পথ—
তেপান্তরের মাঠ কোথা বা,
কোথা বা পর্বত।
কোথা বা সে চড়াই উঁচু,
কোথা বা উতরাই,
কোথা বা পথ নাই।
মাঝে-মাঝে জুটল অনেক ভালো-
অনেক ছিল বিকট মন্দ,
অনেক কুশ্রী কালো।
ফিরেছিলে আপন মনের
গোপন অলিগলি,
পরের মনের বাহির দ্বারে
পেতেছ অঞ্জলি।
আশাপথের রেখা বেয়ে
কতই এলে গেলে,

পাওনা ব'লে যা পেয়েছ
অর্থ কি তার পেলে।
অনেক কেঁদে-কেটে
ভিক্ষার ধন জুটিয়েছিলে
অনেক রাস্তা হেঁটে।
পথের মধ্যে লুঠেল দস্যু
দিয়েছিল হানা,
উজাড় করে নিয়েছিল
ছিন্ন ঝুলিখানা।
অতি কঠিন আঘাত তারা
লাগিয়েছিল বুকে,
ভেবেছিলুম, চিহ্ন নিয়ে
সে সব গেছে চুকে।
হাটে-বাটে মধুর যাহা
পেয়েছিলুম খুঁজি,
মনে ছিল, যত্নের ধন
তাই রয়েছে পুঁজি।
হায় রে ভাগ্য, খোলো তোমার ঝুলি।
তাকিয়ে দেখো, জমিয়েছিলে ধূলি।
নিষ্ঠুর যে ব্যর্থকে সে
করে যে বর্জিত,
দৃঢ় কঠোর মুষ্টিতলে
রাখে সে অর্জিত

নিত্যকালের রতন-কণ্ঠহার ;
চিরমূল্য দেয় সে তারে
দারুণ বেদনার।

আর যা-কিছু জুটেছিল
না চাহিতেই পাওয়া—
আজকে তারা ঝুলিতে নেই,
রাত্রিদিনের হাওয়া
ভরল তারাই, দিল তারা
পথে চলার মানে,
রইল তারাই একতারাতে
তোমার গানে গানে॥

সন্ধ্যা

দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী
তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বস্তুরাজ্যজয়ী,
দিকে দিকে প্রসারিয়া গনিছে সম্বল আপনার।
নবীনা শ্যামলা সন্ধ্যা পরেছে জ্যোতির অলংকার
চিরনববধূ,
অন্তরে সলজ্জ মধু
অদৃশ্য ফুলের কুঞ্জে রেখেছে নিভৃতে।
অবগুণ্ঠনের অলক্ষিতে
তার দূর পরিচয়
শেষ নাহি হয়।
দিনশেষে দেখা দেয় সে আমার বিদেশিনী—
তারে চিনি তবু নাহি চিনি॥

জয়ধ্বনি

যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে
শেষবাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব মোর অদৃষ্টেরে।
বলে যাব, পরমক্ষণের আশীর্বাদ
বারবার আনিয়াছে বিস্ময়ের অপূর্ব আস্বাদ।
যাহা রুগ্ন, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।
বলি, বারবার
পতন হয়েছে যাত্রাপথে
ভগ্ন মনোরথে ;
বারে বারে পাপ
ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ ;
বারবার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত ;
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।
মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটি নি করিতে প্রতিকার—
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার॥

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে—
যত-কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি ॥

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
২৬ নভেম্বর, ১৯৩৯

প্রজাপতি

সকালে উঠেই দেখি
প্রজাপতি একি
আমার লেখার ঘরে,
শেলফের 'পরে
মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা—
রেশমি সবুজ রঙ, তার 'পরে সাদা রেখা টানা।
সন্ধ্যাবেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারারাত
কী ভেবেছে কে জানে তা—
কোনোখানে হেথা
অরণ্যের বর্ণ গন্ধ নাই,
গৃহসজ্জা ওর কাছে সমস্ত বৃথাই॥

বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,

সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্ব-মাঝে ॥

প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুঁথির 'পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে,
তার বেশি সত্য যাহা তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়—
অন্ধকারময়।
(ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী, সে রহস্য জানে না ও কভু।)
পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ—
প্রতিদিন করে তার খোঁজ
কেবল লোভের টানে,
কিন্তু নাহি জানে
লোভের অতীত যাহা। সুন্দর যা, অনির্বচনীয়,
যাহা প্রিয়,
সেই বোধ সীমাহীন দূরে আছে
তার কাছে।

আমি যেথা আছি
মন যে আপন টানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই শূন্যময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারিধারে।
কী আছে বা নাই কী এ,
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয়তো বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে
আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করি' বহুদূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপপুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর॥

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
১০ মার্চ, ১৯৩৯

প্রবীণ

বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ
স্পর্ধা ক'রে পরে ছুটির সাজ।
আকাশে তার আলোর ঘোড়া চলে,
কৃতিত্বেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের ছলে।
বনের তলে গাছে গাছে শ্যামল রূপের মেলা,
ফুলে ফলে নানান্ রঙে নিত্য নতুন খেলা।
বাহির হতে কে জানতে পায়, শান্ত আকাশতলে
প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কর্মে নিত্য লড়াই চলে।
চেষ্টা যখন নগ্ন হয়ে শাখায় পড়ে ধরা,
তখন খেলার রূপ চলে যায়, তখন আসে জরা॥

বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের ভারে ভরা,
চেহারা তার বিলাসিতার রঙের ভূষণ পরা।
বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়—
অন্তরে তাই চিরন্তনের বজ্রমন্দ্র রয়।
জল-ঝরানো ছেলেখেলা যেমনি বন্ধ করে
ফ্যাকাশে হয় চেহারা তার, বয়স তাকে ধরে।
দেহের মাঝে হাজার কাজে বহে প্রাণের বায়ু—
পালের তরীর মতন যেন ছুটিয়ে চলে আয়ু,
বুকের মধ্যে জাগায় নাচন, কণ্ঠে লাগায় সুর,
সকল অঙ্গ অকারণে উৎসাহে ভরপুর।

রক্তে যখন ফুরোবে ওর খেলার নেশা খোঁজা
তখনি কাজ অচল হবে, বয়স হবে বোঝা ॥

ওগো তুমি কী করছ, ভাই, স্তব্ধ সারাক্ষণ—
বুদ্ধি তোমার আড়ষ্ট যে, ঝিমিয়ে-পড়া মন।
নবীন বয়স্ যেই পেরোল খেলাঘরের দ্বারে
মরচে-পড়া লাগল তালা, বন্ধ একেবারে।
ভালোমন্দ বিচারগুলো খোঁটায় যেন পোঁতা।
আপন মনের তলায় তুমি তলিয়ে গেলে কোথা।
চলার পথে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির—
বাইরে এসো, বাইরে এসো, পরমগম্ভীর।
কেবলই কি প্রবীণ তুমি, নবীন নও কি তাও।
দিনে দিনে ছি ছি কেবল বুড়ো হয়েই যাও।
আশি বছর বয়স হবে ওই যে পিপুলগাছ,
এ আশ্বিনের রোদ্দুরে ওর দেখলে বিপুল নাচ ?
পাতায় পাতায় আবোল-তাবোল, শাখায় দোলাদুলি,
পান্থ হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি।
ওগো প্রবীণ, চলো এবার সকল কাজের শেষে
নবীন হাসি মুখে নিয়ে চরম খেলার বেশে ॥

রাত্রি

অভিভূত ধরণীর দীপ-নেভা তোরণদুয়ারে
আসে রাত্রি,
আধা অন্ধ, আধা বোবা,
বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি,
যুগারম্ভসৃষ্টিশালে অসমাপ্তি পুঞ্জীভূত যেন
নিদ্রার মায়ায়।
হয় নি নিশ্চিত ভাগ সত্যের মিথ্যার,
ভালোমন্দ যাচাইয়ের তুলাদণ্ডে
বাটখারা ভুলের ওজনে।
কামনার যে পাত্রটি দিনে ছিল আলোয় লুকানো
আঁধার তাহারে টেনে আনে—
ভরে দেয় সুরা দিয়ে
রজনীগন্ধার গন্ধে,
ঝিমিঝিমি ঝিল্লির ঝননে,
আধ-দেখা কটাক্ষে ইঙ্গিতে।
ছায়া করে আনাগোনা সংশয়ের মুখোষ-পরানো,
মোহ আসে কালো মূর্তি লালরঙে এঁকে,
তপস্বীরে করে সে বিদ্রূপ।
বেড়াজাল হাতে নিয়ে সঞ্চরে আদিম মায়াবিনী
যবে গুপ্ত গুহা হতে গোধূলির ধূসর প্রান্তরে
দস্যু এসে দিবসের রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে যায়॥

বিশ্বনাট্যে প্রথম অঙ্কের
অনিশ্চিত প্রকাশের যবনিকা
ছিন্ন করে এসেছিল দিন,
নির্বারিত করেছিল বিশ্বের চেতনা
আপনার নিঃসংশয় পরিচয়।
আবার সে আচ্ছাদন
মাঝে-মাঝে নেমে আসে স্বপ্নের সংকেতে।
আবিল বুদ্ধির স্রোতে ক্ষণিকের মতো
মেতে ওঠে ফেনার নর্তন।
প্রবৃত্তির হালে ব'সে কর্ণধার করে
উদ্‌ভ্রান্ত চালনা তন্দ্রাবিষ্ট চোখে।
নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
"নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় ক'রে চলা।"

পুনশ্চ, শান্তিনিকেতন
২৬ জুলাই, ১৯৩৯

শেষবেলা

এল বেলা পাতা ঝরাবারে ;
শীর্ণ বলিত কায়া, আজ শুধু ভাঙা ছায়া
মেলে দিতে পারে।
একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা
নানা-রঙ-করা।
কুঁড়ি-ধরা ফলে
কার যেন কী কৌতূহলে
উঁকি মেরে আসা
খুঁজে নিতে আপনার বাসা।
ঋতুতে ঋতুতে
আকাশের উৎসবদূতে
এনে দিত পল্লবপল্লীতে তার
কখনো পা-টিপে চলা হালকা হাওয়ার,
কখনো বা ফাগুনের অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল।
জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে,
বাহিরে প্রকাশ তার নহে।
অন্তরবিধাতার সৃষ্টিনিদেশে
যে অতীত পরিচিত সে নূতন বেশে

সাজবদলের কাজে ভিতরে লুকালো—
বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো।
গোধূলির ধূসরতা ক্রমে সন্ধ্যার
প্রাঙ্গণে ঘনায় আঁধার।
মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে তারা,
আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা।
সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পুরে
সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে।
যত বেড়ে ওঠে রাতি
সত্য যা সেদিনের উজ্জ্বল হয় তার ভাতি।
এই কথা ধ্রুব জেনে নিভৃতে লুকায়ে
সারা জীবনের ঋণ একে একে দিতেছি চুকায়ে॥

১১ জানুয়ারি, ১৯৪০

রূপ-বিরূপ

এই মোর জীবনের মহাদেশে
কত প্রান্তরের শেষে,
কত প্লাবনের স্রোতে
এলেম ভ্রমণ করি শিশুকাল হতে
কোথাও রহস্যঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা,
কোথাও পাণ্ডুর শুষ্ক মরুর নৈরাশ্য,
কোথাও বা যৌবনের কুসুমপ্রগল্‌ভ বনপথ,
কোথাও বা ধ্যানমগ্ন প্রাচীন পর্বত
মেঘপুঞ্জে স্তব্ধ যার দুর্বোধ কী বাণী,
কাব্যের ভাণ্ডারে আনি
স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি,
আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি।
সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করে নি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে ;
তার সংগীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই,
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।

সৃষ্টিরঙ্গভূমিতলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতালঘাতে
উদ্দাম চরণপাতে
সুন্দরের ভঙ্গী যত অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।
তাই আজ বেদমন্ত্রে, হে বজ্রী, তোমার করি স্তব—
তব মন্ত্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষগান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার,
বাণীবিলাসীর কানে ব্যপ্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার॥

জানুয়ারি, ১৯৪০

শেষ কথা

এ ঘরে ফুরালো খেলা,
এল দ্বার রুধিবার বেলা।
বিলয়বিলীন দিনশেষে
ফিরিয়া দাঁড়াও এসে
যে ছিলে গোপনচর
জীবনের অন্তরতর।
ক্ষণিক মুহূর্ততরে চরম আলোকে
দেখে নিই স্বপ্নভাঙা চোখে ;
চিনে নিই, এ লীলার শেষপরিচয়ে
কী তুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অন্তিম সঞ্চয়ে।
কাছের দেখায় দেখা পূর্ণ হয় নাই,
মনে-মনে ভাবি তাই—
বিচ্ছেদের দূরদিগন্তের ভূমিকায়
পরিপূর্ণ দেখা দিবে অস্তরবিরশ্মির রেখায়।
জানি না, বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পীকবি॥

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
৪ এপ্রিল, ১৯৪০